নবীজি কেমন ছিলেন

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

নবীজি

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

কেমন ছিলেন

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন

ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

অর্পণ

ফুলের বুকে গন্ধ সম
ছড়িয়ে আছ বুকে মম,
তোমার ব্যথা প্রিয়তম,
তারি দোলা লাগে।

....

না দেখা হে প্রিয় আমার,
বুকে বেদন জাগে—

....

চোখের পানির এই দরিয়ায়
কেঁদে কেঁদে খুঁজি তোমায়,
কেন আমি জন্মিনি, হায়
তোমার যাওয়ার আগে!

....

পূর্বলেখা

আব্বার কাছে আমার *শামায়েলে তিরমিযী* পড়ার সৌভাগ্য হয়। উনিশশো তিরাশি খৃস্টাব্দে যখন কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়ায় আমি দাওরায়ে হাদীস পড়ি, আব্বা তখন এই কিতাবের ক্লাস নিতেন। শামায়েল অর্থ : রূপ-সৌন্দর্য, চরিতামৃত, আকৃতি-প্রকৃতি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল সম্পর্কিত যত বর্ণনা পাওয়া যায়, এসবের বিশুদ্ধতম চয়ন ইমাম তিরমিযীর এই কিতাব।

কঠিন আরবী শব্দ ও পরিভাষার ব্যাখ্যা, মর্ম ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে আব্বা (আতাউর রহমান খান নদভী রহ.) যখন তুলনামূলক জটিল অথচ সংবেদনশীল, প্রিয় অনুভূতিঋদ্ধ এ অধ্যায়টি পড়াতেন, তখন আমার কিশোরমনে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার উপলব্ধি দোলা দিত। ভাবতাম, আমি তো খেটেখুটে এসব বর্ণনা বোঝার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছি; কিন্তু যাদের পক্ষে দীর্ঘ দিন আরবী ও ইসলামী বিদ্যা শিক্ষাচর্চা সম্ভব হয় না, তাদের পক্ষে এসব প্রেমময় বর্ণনা পড়া ও উপভোগ করা কি আদৌ সম্ভব! বাংলা ভাষায় অতি সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে যদি এসব বর্ণনা পরিবেশন করা যেত, তা হলে তো আগ্রহী প্রতিটি মুসলমানই এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন। সেদিনের অঙ্কুরিত চিন্তাটুকুই আজ দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় (বর্তমানে প্রায় ৩৫ বছর) পর বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

লেখাপড়ার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত হলেও এ সংবেদনশীল বিষয়ে কোনো কিছু লেখার সাহস আমার ছিল না। বহুবার শুরু করেও বেশি দূর এগোতে পারিনি। শুরুটা কোনখান থেকে হবে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে ইত্যাদি ভেবে ভেবে কাজ আটকে গেছে বারবার। এরই মধ্যে দৈনিক *আজাদের* বহু পুরনো এক সীরাতুন্নবী জামীমায় শামায়েলুন্নবী বিষয়ক একটি ছোট্ট লেখা পড়ে আমার ধারণা একটা দিক খুঁজে পায়। ধীরে ধীরে আমার চিন্তা আরও পরিশীলিত হয়। একসময় বিসমিল্লাহ বলে কাজে হাত দিই।

ইতোমধ্যে শিক্ষা ও কার্যোপলক্ষে দেশ-বিদেশের নানা অঙ্গনের সাথে পরিচিত হই। ক্রমে আমার পড়াশোনার পরিধি বেড়ে চলে। নজরে আসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর লিখিত আরবী, উর্দু ও অন্যান্য ভাষার ঐতিহাসিক রচনা, প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তক এবং উৎস-গ্রন্থসমূহ। কুরআন-হাদীস, সিয়ার ও তাওয়ারীখে শামায়েল ও খাসায়েল সম্পর্কিত প্রতিটি বাণী ও তথ্য এ দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান শুরু করার পর যেন বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। অতি ধীরলয়ে বিনির্মিত হয় প্রিয়তম নবীজির আকৃতি-প্রকৃতি, রূপ-সৌন্দর্য আর চরিত্রমাধুরীর প্রীতিময় উপস্থাপনার এক স্বপ্নিল অবকাঠামো। না-দেখা এ প্রিয়তমের কদম মোবারকে ঠাঁই লাভের আকুল আবেগ নিয়ে এ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। এর উসিলায় যদি আমার, আমার আব্বা-আম্মা ও নিকটজনদের ইহ-পরলোক কল্যাণময় হয়ে ওঠে, তবেই আমার সকল পাওয়া পূর্ণ হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রীতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে চাওয়ার তো আর কিছুই নেই!

বিনীত–
উবায়দুর রহমান খান নদভী

ঢাকা
২৭শে রমযান ১৪১৬
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

সূচি

পবিত্র নাসিকা—১৫

পবিত্র মুখ—১৫

পবিত্র মুখের লালা—১৬

পবিত্র হাসি—১৭

পবিত্র কণ্ঠস্বর—১৯

পবিত্র অলঙ্কারপূর্ণ বাণী—২০

সুসংক্ষিপ্ত ঋদ্ধ বাক্য—২১

মস্তক মোবারক—২১

পবিত্র কেশরাজি—২১

প্রসঙ্গ : খেযাব—২৩

দাড়ি মোবারক—২৫

গর্দান শরীফ—২৭

মোবারক স্কন্ধদ্বয়—২৮

পবিত্র বক্ষ—২৮

পূতপবিত্র কলব—২৯

পূতপবিত্র উদর—২৯

পবিত্র বক্ষকেশ—৩০

বগল মোবারক—৩০

পিঠ মোবারক—৩১

মোহরে নবুওয়াত—৩১

পবিত্র বাহুদ্বয়—৩৪

পবিত্র পদযুগল—৩৬

পায়ের গোছা মোবারক—৩৭

পবিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব—৩৮
পবিত্র শরীরের রঙ—৩৮
পবিত্র পদবিক্ষেপ—৪০
হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবু—৪১
পবিত্র স্বেদ ও দেহবর্জ্যসমূহের সুঘ্রাণ—৪১
পবিত্র হস্তের সুঘ্রাণ—৪৪
নবীজি কেমন ছিলেন—৪৫
যে ছবি যায় না আঁকা—৪৬
কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার—৪৭
পোশাক-পরিচ্ছদ—৫০
পানাহার—৫১
দিবা-রাত্রির কার্যসূচি—৫২
বিছানা ও আসবাবপত্র—৫৩
বাসস্থান—৫৩
চাঁদের চেয়েও সুন্দর!—৫৪
অন্তিম লগ্ন—৫৬
পবিত্র অনুভব!—৫৮
রাসূলুল্লাহর অনুপম দেহাবয়ব—৫৯
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্য—৭২
শ্রেষ্ঠ চরিত্র—৭৩
সহনশীলতা ও ক্ষমা—৭৪
ধৈর্য ও স্থৈর্য—৭৫
মহাবিজয়ের দিন—৭৬
প্রকৃতিগত সুস্থতা—৭৬
অঙ্গীকার পালন—৭৭
বীরত্ব—৭৮
অল্পে তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল—৭৯
স্বভাবগত বিনয়—৮০

সততা ও বিশ্বস্ততা—৮০
নম্রতা—৮১
অনাবিল অন্তর—৮৪
স্নেহ-মমতা—৮৪
ত্যাগ ও ধৈর্য—৮৪
সংসার-নির্লিপ্ততা ও সংযমশীলতা—৮৮
আল্লাহর ভয়—৮৯
অন্তরের কোমলতা—৮৯
করুণা ও দয়ার্দ্রতা—৯০
আল্লাহর দাসত্ব—৯১
আল্লাহ তাআলার সঙ্গ—৯৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র্য—৯৪
অনন্য বৈশিষ্ট্য—৯৭
সহনশীলতা ও ক্ষমা—৯৯
পরকালচিন্তা—১০০
স্বভাবগত বিষয়াদি—১০০
উদ্বেগ—১০৫
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সৌন্দর্য—১০৫
প্রিয় নবীজির বদান্যতা—১০৭
রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিষ্ণুতা—১১১
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔদার্য ও ক্ষমা—১১৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব ও শৌর্য—১১৫
পরিবারবর্গের সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে—১১৬
বিপদসঙ্কুল অবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ও সুসময়ে সংযম—১১৭
আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক—১১৯
স্বভাবগত মিতাচার ও অনুপম রুচিশীলতা—১২৫

পবিত্র নাসিকা

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাসিকা মোবারক এত নূরানি এবং উজ্জ্বল ছিল যে, কোনো দর্শক ভালোভাবে খেয়াল করে না দেখলে সাধারণত এরকমই দেখতে পেত যে, তাঁর নাসিকা মোবারক উন্নত; কিন্তু আসলে তা অতিরিক্ত উঁচু বা উন্নত ছিল না, বরং নূরের তাজাল্লির ফলে এরকম উঁচু মনে হতো। অধিকন্তু এ দৃশ্যমান উচ্চতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও পরম নেকবখতির দ্যুতি পরিস্ফুটিত হতো।

পবিত্র মুখ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারক সম্পর্কে হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে *সহীহ মুসলিমে* এরূপ বর্ণনা এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত মুখগহ্বরের অধিকারী ছিলেন। এরকম বর্ণনা *শামায়েলে তিরমিযী*তে হযরত ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত মুখগহ্বরের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী হতো ভরাট স্বরবিশিষ্ট।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যে বাণী বের হতো, তা ছিল নেহায়েত সম্পন্ন ও ভরাট বাক্যের সমাহার। তিনি কখনো অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতেন না। তিনি ছিলেন নিতান্তই স্পষ্টভাষী।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সর্বদাই ঠোঁটের কাছাকাছি থাকত। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে বিলম্ব করে তিনি কিছু বলতেন না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁত উজ্জ্বল, শুভ্র ও প্রশস্ত ছিল।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁত উজ্জ্বল ও চকচকে ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠযুগল প্রশস্ত ছিল। যখন তিনি কথোপকথন করতেন, তখন এরকম দেখা যেত, যেন ওষ্ঠযুগলের ফাঁক দিয়ে সামনের দাঁত থেকে নূরের ঝিলিক বেরোচ্ছে।

ইমাম তাবরানী রহ. *আওসাত* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখগহ্বরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ সমগ্র মানবজাতির চেয়ে বেশি ছিল। এক বর্ণনায় আছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্ত মোবারক পরিমিত বড় ছিল—অর্থাৎ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট ছিল।

পবিত্র মুখের লালা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের লালা রোগীদের জন্য পূর্ণ শেফা ছিল। হাদীস শরীফে আছে, খায়বারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল, তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখের লালা মোবারক তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সুস্থ হয়ে গেলেন।

অন্য এক ঘটনা। একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি পানির মশক আনা হলো। তিনি সেখান থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করে উক্ত মশকের মধ্যে ফেলে দিলেন। এরপর উক্ত

মশকের পানি যখন কূপে ফেলা হলো, তখন তার পানি থেকে কস্তুরির সুঘ্রাণ ছড়াতে লাগল।

একদা হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কূপের পানিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র মুখের লালা মোবারক ফেলে দিলেন। এরপর দেখা গেল, মদীনা শরীফের সমস্ত কূপের পানির চেয়ে উক্ত কূপের পানিই অধিক সুপেয় আর সুস্বাদু হয়ে উঠেছিল।

একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কতিপয় দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনা হলো। তিনি স্বীয় মুখের লালা মোবারক তাদের মুখে দিলেন। অতঃপর শিশুগুলো এতই পরিতৃপ্ত হলো যে, সারাদিন তারা আর দুধই পান করল না।

ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জিহ্বা মোবারক তাঁর মুখের ভেতর পুরে দিলেন। প্রিয় দৌহিত্র নানাজানের জিহ্বা মোবারক চুষতে লাগলেন। সমস্ত দিন তিনি আর ক্ষুৎপিপাসা অনুভব করলেন না। এ ধরনের অসংখ্য মোজেযা রয়েছে।

পবিত্র হাসি

সহীহ বুখারী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো জোরে অট্টহাসি দিতে দেখেননি—যাতে মুখের কণ্ঠতালু দৃষ্টিগোচর হয়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠাধরে সর্বদাই মৃদু হাসি লেগে থাকত। কোনো কোনো হাদীসে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি এত বেশি হাসতেন না, যাতে নাওয়াজেয দাঁত দৃষ্টিগোচর হয়। চোয়ালের শেষ প্রান্তের দাঁতকে ‘নাওয়াজেয’ বলা হয়।

ওপরের বর্ণনা কোনো ব্যক্তির অত্যধিক হাসাহাসি করার একটা উদাহরণমাত্র। এখানে নাওয়াজেয বলতে আক্কেল দাঁত বোঝানো হয়নি, বরং সাধারণ দন্তপাটিকেই বোঝানো হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি 'মৃদু হাসি'ই ছিল। আওয়াজবিহীন বড় হাসিকে জিহক বলা হয়। আর জিহকের প্রাথমিক অবস্থা মুচকি হাসি; এতে খুশির প্রাবল্য যদি বেশি থাকে, তবে কখনো কখনো দু'একটি দাঁত প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক;—এরূপ অবস্থায় যদি আওয়াজ বিদ্যমান থাকে, তবে তাকে বলা হয় কাহ্‌কাহা বা অট্টহাসি; নিঃশব্দে হাসলে এবং এতে দাঁত প্রকাশ পেলে তাকে বলে জিহক; আর যদি একেবারে শব্দ না থাকে এবং দাঁতও বের না হয়, তবে সে হাসিকে 'তাবাস্‌সুম' বা মৃদু হাসি বলে। *সাররাহ* নামক কিতাবে আছে, ওষ্ঠদ্বয় মিলিত থাকা অবস্থায় যে হাসি হয়, তাকে তাবাস্‌সুম বলে। তবে তাবাস্‌সুম বা মুচকি হাসির এ সংজ্ঞাই সমধিক প্রসিদ্ধ যে, নিঃশব্দ হাসিতে দাঁতের শুভ্রতা ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ থেকে বিশেষতর অবস্থার অধিকাংশ হাসি তাবাস্‌সুম বা মুচকি হাসি ছিল। তবে এটা হতে পারে যে, কখনো কখনো তিনি জিহক হাসি হেসেছেন, কিন্তু তাই বলে জিহকের সীমা অতিক্রম করেননি আর কাহ্‌কাহা বা অট্টহাসির তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, অট্টহাসি অপছন্দনীয়। অধিক হাসাহাসি করলে বা জিহক হাসির আধিক্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়।

ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাসতেন, তখন পার্শ্ববর্তী দেয়াল আলোকিত হয়ে যেত এবং তাঁর পবিত্র দাঁতের নূরে দেয়াল সূর্যরশ্মির ন্যায় ঝিলিক মারত। তিনি যখন ক্রন্দন করতেন, তখনও এরূপ অবস্থা হতো। ক্রন্দনের সময় আওয়াজ উচ্চ হতো না। পবিত্র চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হতো। তামার ডেকচির ভেতর ফুটন্ত পানির শব্দের মতো পবিত্র বক্ষাভ্যন্তর থেকে একধরনের বিশেষ শব্দ শোনা যেত।

কোনো কোনো বর্ণনায় তাকে যব ভাঙানোর চাকা ঘূর্ণনের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর এরকম ক্রন্দন কখনো নিজের দুঃখ-যাতনার জন্য হতো না। তিনি কাঁদতেন আল্লাহ তাআলার প্রবল পরাক্রান্ত সিফাতের

গভীরতা অনুধাবনের কারণে, উম্মতের প্রতি অপার স্নেহ-মমতা বা কোনো মৃতের তরে আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করার জন্যে। তিনি যখন তন্ময় হয়ে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতেন অথবা কোনো কোনো সময় রাতে নামায আদায় করতেন, তখন এমন করুণ অবস্থার উন্মেষ ঘটত। নবীজি কখনো হাই তুলতেন না;—হাই তোলা দৈহিক অবসন্নতার বহিঃপ্রকাশ। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে এরকম অবস্থা আদৌ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কাজটি থেকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনা এরকমও আছে, কোনো নবীই কখনো হাই তোলেননি। এক হাদীসে এরকম আছে, হাই শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। কারও যদি হাই প্রবল হয়ে যায়, তা হলে বাম হাতের পিঠ মুখের ওপর স্থাপন করতে হবে অথবা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরতে হবে। হাই তোলার সময় আলস্যসূচক কোনো শব্দ মুখ থেকে বের করা খুবই অপছন্দনীয় কাজ।

এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি হাই তুলে আওয়াজ বের করে, শয়তান তার মুখের ভেতর থেকে হাসাহাসি করতে থাকে।

পবিত্র কণ্ঠস্বর

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর ছিল সীমাহীন প্রীতিপূর্ণ। তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত ধ্বনি ও তার মাধুর্য অন্য সকল আওয়াজের চেয়ে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল। তাঁর চেয়ে সুন্দর আওয়াজ ও মিষ্টি কথার কোনো মানুষ পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর রসনা মোবারক মাখরাজ থেকে শব্দ বের করে এনে যথাযথ উচ্চারণ করতে যেমন সক্ষম ছিল, তেমনি ছিল তাঁর বাক্যে সঠিকত্ব, বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আজ পর্যন্ত কেউই উক্ত গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হননি।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবীকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি, যাঁর কণ্ঠস্বর ও বাক্যাবলি সুন্দর ছিল না। আর উক্ত গুণাবলির দিক দিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাগ্রে।

অন্য কোনো মানুষের কণ্ঠ যেখানে পৌঁছুতে ব্যর্থ হতো, সেখানে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ধ্বনি বিনা বাধায় পৌঁছে যেত—বিশেষ করে নসিহত, সতর্কীকরণ বা সুসংবাদ-সম্বলিত বক্তৃতায়। সুতরাং পর্দার অন্তরালে নারীসমাজও সে আওয়াজ শুনতে পেত। পবিত্র হজ সম্পাদনকালে মিনা প্রান্তরে তিনি যে খুতবা প্রদান করেছিলেন, সে খুতবা সমস্ত লোকের কর্ণকুহরে পৌঁছে গিয়েছিল। দূরের ও কাছের সবাই আপন অবস্থানে থেকেই সে খুতবা শুনতে পেয়েছিলেন।

পবিত্র অলঙ্কারপূর্ণ বাণী

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে উচ্চারিত ভাষার অলঙ্কার, গভীর ভাবসম্পন্ন বাক্য, আশ্চর্য ধরনের প্রকাশভঙ্গিমা, বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি তাঁর মধ্যে এত বিপুল ছিল যে, কেউ এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর তুলনীয় হতেও সক্ষম নয়।

একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো কখনো বিদেশে তাশরিফ নিয়ে যাননি বা মানুষের সঙ্গে তেমন ওঠা-বসা করেননি, তা সত্ত্বেও এরূপ অলঙ্কৃত ভাষা আপনি কোত্থেকে লাভ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের ভাষা ও পরিভাষা, যা বিলুপ্ত ও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আর আমি সেগুলো রপ্ত করে নিয়েছি। তদুপরি তিনি বলেছেন, আমার রব আমাকে আদব শিখিয়েছেন। অতএব, আমাকে তিনি সর্বোৎকৃষ্টরূপে শিষ্ট, পরিশীলিত ও মার্জিত করেছেন। আদবের বাচনিক পর্যায়ে অলঙ্কারযুক্ত কথা এবং স্থান-কাল ও পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ বা হৃদয়স্পর্শী ভাষণও এর সাথে সম্পৃক্ত।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালন হয়েছে বনী সাদ ইবনে বকর গোত্রে—অর্থাৎ, এটি ছিল তাঁর ধাত্রীমাতা হযরত হালিমা সাদিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গোত্র। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সমস্ত আরবে ভাষার বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে ছিলেন।